সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৩৫

হরিনাথ মজুমদার

(কাঙ্গাল হরিনাথ)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৩৫

হরিনাথ মজুমদার

(কাঙ্গাল হরিনাথ)

১৮৩৩—১৮৯৬

হরিনাথ মজুমদার

(কাঙ্গাল হরিনাথ)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক

শ্রীরামকমল সিংহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—অগ্রহায়ণ ১৩৫০

মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

৩—২৯।১১।১৯৪৩

জন্ম ; বাল্য-জীবন

১২৪০ সালের শ্রাবণ মাসে (ইং ১৮৩৩) নদীয়ার অন্তঃপাতী কুমারখালী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত তিলি-পরিবারে হরিনাথ মজুমদারের জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম—হলধর মজুমদার। হরিনাথের বাল্য-জীবন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ-দারিদ্র্যে পূর্ণ। তিনি আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন :—

> যখন আমার বয়স এক বৎসর অতিক্রম করে নাই, তখন মাতৃদেবী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। আমি মাতৃহীন হইয়া অজ্ঞানাবস্থায় যে কত কাঁদিয়াছি, তাহা কে বলিতে পারে? খুল্লপিতামহী আমাকে প্রতিপালন করেন। আমার পিতা পুনর্বার দারপরিগ্রহ করেন নাই, কিন্তু বোধ হয় তন্নিমিত্তই সংসারে উদাসীন ছিলেন। তিনি বিষয়কার্য্যে তাদৃশ মনোযোগ বিধান না করায়, পৈতৃক সম্পত্তি যাহা ছিল, তৎসমুদায়ই নষ্ট হয়। সুতরাং মাতৃবিয়োগ হইতেই সাংসারিক দুঃখ যে আমার সহচর হইয়াছে, সে কথা বলা বাহুল্য। বাল্যখেলার সময় অন্য বালকেরা ক্রীড়োপযোগী বস্তু পিতা মাতার নিকটে সহজে পাইয়া আনন্দ করিয়াছে, আমি তন্নিমিত্ত ক্রন্দন করিয়া মাটি ভিজাইয়াছি, এই অবস্থায় কতক দিন গত হয়। পরে বিদ্যাভ্যাসের সময় উপস্থিত হইল। পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিলেন, নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া কত কাঁদিলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সময় কুমারখালীনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন মজুমদার মহাশয়

একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। অধ্যয়নের নিমিত্ত তাহাতে প্রবেশ করিলাম। খুল্লতাত শ্রীযুক্ত নীলকমল মজুমদার মহাশয় পুস্তকাদির ব্যয় ও স্কুলের বেতন সাহায্য করিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার কর্ম্ম গেল। অর্থাভাবে আমারও লেখাপড়া বন্ধ হইল। স্কুলের হেডমাষ্টার কৃষ্ণধন বাবু বিনা বেতনে কতক দিন শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ ও পুস্তকাদির অসদ্ভাবে আমাকে অধিক দিন বিদ্যালয়ে তিষ্ঠিয়া থাকিতে দিল না।

স্বদেশ-সেবা

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

বাল্যকালে আশানুরূপ শিক্ষালাভ করিতে না পাবায় হরিনাথের মনে ক্ষোভ ছিল। স্বগ্রামস্থ বালকগণের শিক্ষার অভাব তিনি মনে প্রাণে অনুভব করিতেন। এই অভাব কথঞ্চিৎ দূর করিবার জন্য তাঁহারই যত্নচেষ্টায় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারি কুমারখালীতে একটি বাংলা পাঠশালা সংস্থাপিত হয়। তিনি বিনা-বেতনে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা গ্রহণ ও অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা-কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। যে-সকল বিষয়ে তাঁহার সম্যক্ জ্ঞান ছিল না, তাহা গৃহে বাল্যসখা মথুরানাথ মৈত্রেয়ের (অক্ষয়কুমারের পিতার) সাহায্যে অধিগত করিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

ক্রমে বিদ্যালয়টি গবর্মেণ্টের অর্থসাহায্যলাভে সমর্থ হইল। স্কুল-কমিটি হরিনাথের বেতন ২০৲ টাকা স্থির করিলেন। কিন্তু হরিনাথ এই টাকা পূরা গ্রহণ করিলেন না। তিনি আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন :—

> আমি বিশ টাকা গ্রহণ করিলে, নিম্নশ্রেণীস্থ শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না। আমি পনের টাকা গ্রহণ করিয়া নিম্নশ্রেণীস্থ শিক্ষকদিগের যথাযোগ্য বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়া সুখী হইলাম। এই পনের টাকা পর্য্যন্তই আমার জীবনের বৈতনিক উপার্জ্জন।

বালিকাদের শিক্ষার জন্য হরিনাথ কুমারখালীতে একটি বালিকা-বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

কুমারখালীতে বঙ্গবিদ্যালয় ও বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে হরিনাথ 'সংবাদ প্রভাকরে' (১৫ এপ্রিল ১৮৫৭) একখানি পত্র প্রকাশ করেন; পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

> এই কুমারখালী গ্রামে ইতিপূর্ব্বে সুপ্রণালীসিদ্ধ বিদ্যা-মন্দির না থাকায় তন্নিবাসী বালকবৃন্দ আলস্য সলিলে অঙ্গ ঢালিয়া অন্যান্য জনগণের গলগ্রহ হইয়া উঠিয়াছিল। এই নিষ্কলঙ্কিত গ্রাম তাহাদের অত্যাচারে নানা কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াছিল, বিদ্যালোচনা ব্যতীত এই অনিষ্ট নিবারণ কল্পে কি কোন সদুপায় নাই, বিবেচনায়…শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ কুণ্ডু মহাশয় ইং ১৮৫৪ সালের ১৭ জানুয়ারীতে অত্র গ্রামে এক ইংরাজী ও বাঙ্গলা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং তদনুজ

হরিনাথ মজুমদার

শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয় ই° ১৮৫৫ সালের ১৩ জানুয়ারীতে তথায় আর একটি বাঙ্গলা পাঠশালা সংস্থাপন করিয়া আপামর সাধারণের মহদুপকার করিয়াছেন, এই সদনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইতে তাঁহারদিগকে যে কতই কষ্ট কাটবা সহ্য করিতে ও কতই বা কষ্ট স্বীকার করিতে হইযাছিল তাহার পরিসীমা নাই। কুসংস্কারশীল কতিপয় মহাশয়েরা কতবার তাহার সমূলোচ্ছেদ করিবার যত্ন পাইয়াছিলেন. কিন্তু তাহাতে উচ্ছেদ না হইয়া বরং অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের অমোঘ যত্ন ও উৎসাহ-উৎস উৎসারিত হইয়া বিদ্যা-তরু দিন দিন ফলবান্ হইতেছে, আহা, কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! যে গ্রামে নূতন প্রথানুসারে একটি বাঙ্গলা পাঠশালা স্থাপন করিতে কত ব্যক্তি বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন, সেই গ্রামে ই° ১৮৫৬ সালের ২৩ ডিসেম্বরে অশেষ-গুণালঙ্কৃত শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণধন মজুমদার মহাশয়ের যত্নবলে একটি বালিকা পাঠশালা সংস্থাপিত হইয়াছে, তিনি প্রথমতঃ আপন ভ্রাতুষ্পুত্রীকে উক্ত বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন, তদনন্তর গ্রামস্থ ভদ্রাভদ্র সকলের বালিকা এই বিদ্যামন্দিরে পর্য্যায় প্রবিষ্ট হইতেছে! এ বিষয়ে এক্ষণে আর কাহারো কোন আপত্তি নাই বরং উৎসাহেরই নিদর্শন প্রদর্শন হইতেছে, সুতরাং অত্যল্প দিনের মধ্যেই যে বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতি হইবে তাহার আর সংশয় কি?

কুমারখালী।
বিদ্যোৎসাহিনী সভা।

শ্রীহরিনাথ মজুমদার।

যে বঙ্গবিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠার মূলে হরিনাথ ছিলেন, সেই প্রতিষ্ঠানটি সম্বন্ধে একখানি পত্র 'সংবাদ প্রভাকরে' (২৭ ডিসেম্বর ১৮৫৯) প্রকাশিত হয়, তাহাও উদ্ধৃত হইল :—

প্রায় পঞ্চ বৎসরাতীত হইল কতিপয় সজ্জনের বিশেষোৎসাহে এই কুমারখালীতে একটি বঙ্গবিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। পরে অল্পদিন ছাত্রবৃন্দের ও আয়ের ক্রমশঃ উন্নতি হওয়াতে পূর্ব্বভাগের ইনিস্পেক্টর শ্রীযুক্ত হেনেরি উড্রো সাহেব মহাশয় অত্রস্থানে আগমন করিয়া ছাত্রদিগের পরীক্ষা করেন, এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী উত্তমরূপ দেখিয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্যাধীন করিয়াছিলেন, পরে কয়েক বৎসর সুপ্রণালীতে বালকদিগের শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হওয়াতে নয় জন বালক ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! সার্দ্ধ বৎসর হইল এই বিদ্যালয়ের ভবনাভাবে ভগ্নাবস্থা হওয়াতে ছাত্রগণেরও আয়ের দিন দিন ন্যূন হইতেছে, তথাচ এ বর্ষ পাঁচ জন ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য বিদ্যালয়ে প্রবেশানুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে। তদ্দর্শনে এতন্নগরস্থ সর্ব্বসাধারণের অন্তঃকরণে যে কীদৃশ আহ্লাদের সঞ্চার হইয়াছে, তাহা লিখিয়া শেষ করা অসাধ্য। এমন কি যে মহাশয়দিগের এই বিদ্যালয়ের প্রতি বিশেষ দ্বেষ ছিল, তাঁহারাও সন্তুষ্ট হইয়া এখন আগ্রহপূর্ব্বক আপনাপন পুত্র দিতে যত্নবান হইয়াছেন। যাহা হউক এক্ষণে এই বক্তব্য এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ মজুমদার মহাশয়ের সাতিশয় যত্নে ও অপরিসীম শ্রমগুণে এবং শ্রীযুক্ত বাবু মথুরানাথ কুণ্ডু সম্পাদক মহাশয়ের অপার সৌজন্যে এই বিদ্যালয়ের

এত দূর উন্নতি সাধন হইয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই,…।
শ্রীদ্বারকানাথ প্রামাণিক। সাং কুমারখালি।

সাহিত্য-সাধনা

'সংবাদ প্রভাকরে' প্রাথমিক রচনা

অল্প বয়স হইতেই গদ্য-পদ্য রচনায় হরিনাথের অভ্যাস ছিল। তিনি মাঝে মাঝে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে রচনাদি পাঠাইতেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেগুলি প্রয়োজন-মত সংশোধন করিয়া 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ করিতেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২১ অক্টোবর তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে তাঁহার একটি রচনা উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

প্রাঞ্জলিপূর্ব্বক প্রণতি পরার্দ্ধ নিবেদন মিদং।

নিম্ন লিখিত কয়েক পংক্তি পদ্য রচনা সংশোধন করত ভবদীয় পৃথ্বী প্রপূজ্য প্রভাকর পত্রিকা প্রান্তে প্রকটন করিয়া জ্ঞান প্রপন্নকে জ্ঞান প্রদানে বাধিত করিবেন ইতি।

টাকা।

পদ্য।

ধিক্ ধিক্ ধিক্ টাকা, ধিক্ ধিক্ ধিক্।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে, কি কব অধিক॥

রজত কাঞ্চন ছিল, জগত রঞ্জিত।
অঙ্কিত হইয়া তারা, হোলো কলঙ্কিত॥
তোমাকে করিল সৃষ্টি, করিতে সুসার।
অসার হইয়া হোলে, বিবাদের সার॥
তোমার কারণে লোক, লাঠালাঠি করে।
কত শত জমীদারে, গেল ছারখারে॥
তোমার কারণে ঘটে, অঘট ঘটনা।
পুত্র হোয়ে জনকেরে, করে প্রবঞ্চনা॥
সহোদর তুল্য প্রিয়, ত্রিভুবনে নাই।
তোমা হেতু কাটাকাটি, করে দুই ভাই॥
তোমাতে মাতিয়া দেখ, যত মর্ত্যলোক।
একেবারে হারায়ে, বসেছে পরলোক॥
টাকা ধ্যান টাকা জ্ঞান, টাকা বুকে ধোরে।
কত লোক মোরে গেল, টাকা টাকা কোরে॥
আঁধার ঘরেতে ধন, চাবি দিয়া রেখে।
শুকায়ে মরিছে লোক, ফেণ মাত্র চেখে॥
ইহার অধিক আর, কি আছে অধিক।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ টাকা, ধিক্ ধিক্ ধিক্।
ধিক ধিক্ ধিক্ তোরে, ধিক ধিক্ ধিক॥

—*—

তোমা হেতু কত জন, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে।
অপরের প্রাণ নাশে, ধর্ম্ম কর্ম্ম খেয়ে॥
নিয়ম অতীত কেহ, পরিশ্রম করে।
অকালে কালের গ্রাসে, ভুক্ত হোয়ে মরে॥

আত্মীয় স্বজন তেজি,   কত শত জন।
তোমা হেতু করিতেছে,   সমুদ্র লঙ্ঘন॥
কত সদ্বিদ্যাবান,   জ্ঞান হারাইয়ে।
রাজদ্বারে দণ্ডনীয়,   উৎকোচ খেয়ে॥
কত বুধ মহাশয়,   তোমার কারণ।
শাস্ত্রের যথার্থ ভাব,   করিছে গোপন॥
তোমার লোভেতে লোক,   পাগলের প্রায়।
পর ধন হরি পরে,   বেড়ী পরে পায়॥
তুমি অর্থ একমাত্র,   অনর্থের হেতু।
চোকের পর্দ্দা উল্‌টাযেছ,   ভেঙ্গে লজ্জা সেতু॥
তব গুণ বল্‌তে প্রাণ,   চলে ধিক্ ধিক ধিক্।
ধিক ধিক ধিক তোরে,   ধিক ধিক ধিক॥

—*—

টাকা হে তোমার গুণে,   কত কাণ্ড হয়।
ব্যাধি হোতে মুক্ত হোয়ে,   কত মহাশয়।
তোমাকে তেজিতে মনে,   কষ্ট বোধ করি
বৈদ্যরাজ ফাঁকি দেয়,   সুমন্ত্রণা [illegible]॥
সমুহে রয়েছে ব্যাধি,   এই কথা বলে।
মিথ্যাবাদী হোয়ে থাকে,   সুজন মণ্ডলে॥
তোমার কারণে টাকা,   বিজ্ঞ ফটিক চাঁদে।
ধনী হোয়ে ডাক্তারের,   পায়ে পড়ে কাঁদে॥
এ কথা বলিতে মনে,   লজ্জা হয় ভারি।
পেটে টাকা পেটে ক্ষুধা,   বিড়ম্বনা ভারি॥
তোমার মায়ায় মুগ্ধ,   হোয়ে কত জন।
সন্তানের ব্যাধি রাখে,   করিয়ে গোপন॥

টাকার কারণে আর, পুত্র প্রাণাধিক।
ধিক্ ধিক ধিক্ টাকা, ধিক্ ধিক্ ধিক্।
ধিক ধিক্ ধিক তোরে, ধিক্ ধিক্ ধিক্॥

—*—

পরের দৃষ্টান্ত আগে, দিয়ে এতক্ষণ।
নিবেদন করি কিছু, আত্ম বিবরণ॥
হই নাই যত দিন, তোমার অধীন।
অচিন্তায় কত সুখে, কাটায়েছি দিন॥
হৃষ্ট পুষ্ট ছিল কায, সবল অন্তর।
তিলার্দ্ধের হেতু সুখ, ছিল না অন্তর॥
তোমার অধীন হোযে, সে সব গিয়াছে।
বপুরাজ্যে দুর্ভাবনা, রাজা হইয়াছে॥
ইতিপূর্ব্বে প্রিয়বন্ধু, তুষিত স্বভাবে।
তোমার কারণ কটু, কহিছে আভাষে॥
সন্দেহ করিছে কত, আত্ম পরিজন।
ইহা হোতে বরণ্ ভাল, এ দেহ পতন॥
অল্প দিন হইয়াছি, তোমার অধীন।
অসহ্য যাতনা দিয়া, দেহ কর ক্ষীণ॥
সকলি করেছ তুমি, বাকী কি রেখেছ।
বন্ধু বিচ্ছেদের সূত্র, সূচনা করেছ॥
ইহা হোতে কষ্ট বল, কি আছে অধিক।
ধিক্ ধিক্ ধিক টাকা ধিক্ ধিক ধিক্।
ধিক ধিক ধিক তোরে, ধিক্ ধিক্ ধিক্॥

শ্রীহরিনাথ মজুমদার।
সাং কুমারখালি।

ঈশ্বর গুপ্তের উপদেশ ও সহায়তায় হরিনাথ সুলেখক হইয়া উঠিলেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার 'বিজয়-বসন্তে'র কথা কে না জানেন ? আর কোন বাংলা গ্রন্থের ভাগ্যে এরূপ বহুল প্রচার ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ।

জমিদার, মহাজন, কুঠিয়াল ও গোরা পল্টনের উৎপীড়নে প্রজাপুঞ্জের দুর্দশা দেখিয়া হরিনাথের হৃদয় ব্যথিত হইত। তিনি এই সকল অত্যাচারের কথা কখন কখন সংবাদপত্রের স্তম্ভে প্রকাশ করিতেন। অবশেষে তিনি পল্লীবাসীদের আর্ত্তনাদ রাজদ্বারে পৌঁছাইবার জন্য নিজেই একখানি পত্রিকা প্রকাশের সঙ্কল্প করিলেন।

'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল (১২৭০, বৈশাখ) মাসে হরিনাথ 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' নামে একখানি মাসিক সমাচার পত্র প্রকাশ করিলেন। ইহা কলিকাতায় গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত হইত। পত্রিকার কণ্ঠে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

গুণালোকপ্রদা দোষপ্রদোষধ্বান্ত-চন্দ্রিকা।
বাজতে পত্রিকা নাম গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা ॥

১২৮১ সালের এক সংখ্যা 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' দেখিয়াছি ; তাহার মলাটের উপর এই কবিতাংশ মুদ্রিত দেখিতেছি :—

Some to the fascination of a name
Surrender judgement hoodwinked—
Cowper

১২৭৪ (?) সালের বৈশাখ মাসে 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'র একটি পাক্ষিক সংস্করণও প্রকাশিত হয় ; ১২৭৭ সালের বৈশাখ হইতে পাক্ষিক সংস্করণ সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। নানা কারণে 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতে পারে নাই।

হরিনাথের অপ্রকাশিত আত্মজীবনীতে 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' সম্বন্ধে যে-সকল কথা আছে, তাহা হুবহু উদ্ধৃত করায় বাধা আছে, এই কারণে স্থানে স্থানে বাদ দিয়া নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইল :—

> আমি শুনিলাম, বাঙ্গলা সংবাদপত্রের অনুবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহার মর্ম্ম অবগত হইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত একটি কার্য্যালয়ও স্থাপিত হইবে। 'ঘরে নাই এক কড়া, তবু নাচে গায় পড়া'। আমার ইচ্ছা হইল, এই সময় একখানি সংবাদপত্র প্রচার করিয়া, গ্রামবাসী প্রজারা যে যে ভাবে অত্যাচরিত হইতেছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের কর্ণগত করিলে, অবশ্যই তাহার প্রতিকার এবং তাহাদিগের নানা প্রকার উপকার সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই। গ্রাম ও গ্রামবাসী প্রজার অবস্থা প্রকাশ করিবে বলিয়া পত্রিকার নাম 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' রাখিয়া 'গিরিশযন্ত্রে'র কর্ত্তা গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে একটি শিরোমুকুট অর্থাৎ হেডিং আর একটি শ্লোক প্রস্তুত করিতে প্রতিশ্রুত করাইলাম। [১৪২৪ পৃ.]

কুমারখালী বাঙ্গলা পাঠশালার যে ছাত্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় নর্ম্মাল স্কুলে প্রবেশ করিয়াছিলেন,

সেই পুলিনচন্দ্র সিংহ, দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করায় (প্রধান শিক্ষক আমি) আমার শ্রম অনেক লাঘব হইল। উক্ত পাঠশালার যে যে ছাত্র তখন নিজ নিজ পৈতৃক বিষয়কার্য্য করিয়া উন্নতি প্রদর্শনে প্রশংসালাভ করিতেছেন, সেই কৈলাসচন্দ্র প্রামাণিক ও গোবিন্দচন্দ্র চাকীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া অবধারিত করিলাম, তাঁহারা মূলধন সংগ্রহ করিয়া একটি পুস্তকালয় স্থাপন করিবেন। উক্ত পুস্তকালয় হইতে সম্বাদ পত্রিকা গ্রামবার্ত্তা ও প্রকাশিত হইবে। আমি পত্রিকার সম্পাদক হইয়া এবং নিজ স্কন্ধে তাহার দায়িত্ব রাখিয়া লিখিবার ভার বহন করিব। কিন্তু আর্থিক ক্ষতিবৃদ্ধির নিমিত্ত দায়ী হইব না, পুস্তকালয় যেমন লাভ গ্রহণ তদ্রূপ ক্ষতিও স্বীকার করিবে। যদি পুস্তকালয় পত্রিকার নিমিত্ত বিশেষ লাভবান হয়, তবে আমি তখন ভাতা-স্বরূপ কিছু কিছু পাইব ....(১৪২৫-২৬ প.)

গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা সংবাদপত্রিকার দ্বারা গ্রামের অত্যাচার নিবারিত ও নানা প্রকারে গ্রামবাসীদিগের উপকার সাধিত হইবে এবং তৎসঙ্গে মাতা বঙ্গভাষা ও সেবিতা হইবেন, ইত্যাদি নানা প্রকার আশা করিয়া পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষদিগের উক্ত নিয়মে অগত্যা বাধ্য হইয়া 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'র কার্য্য আরম্ভ করিলাম। ১২৭০ বার শত সত্তর সাল, বৈশাখ মাসে কলিকাতা গিরিশ বিদ্যারত্ন-যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রথমতঃ মাসে একবার চারি ফর্ম্মা করিয়া গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকার প্রচার আরম্ভ হইল। প্রথম বৎসর লাভ দেখিয়া দ্বিতীয় বৎসরও পুস্তকালয় গ্রামবার্ত্তার ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকার করিলেন। দ্বিতীয় বৎসরে ক্ষতি হইল দেখিয়া তাহার অধ্যক্ষরা তৃতীয় বৎসরে পুস্তকালয়ের কার্য্য

বন্ধ করিলেন সুতরাং গ্রামবার্ত্তা প্রচারের উপায়ও তৎসঙ্গে বন্ধ হইল। সংবাদপত্র লিখিয়া লাভবান্ হইব, আমি এই ইচ্ছায় তাহার কার্য্যভার গ্রহণ করি নাই। সুতরাং লাভ না দেখিয়া লাভাভিলাষী পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষগণের ন্যায় গ্রামবার্ত্তা প্রচারের ইচ্ছা আমার সঙ্কোচিত হইল না, বরং আরও বলবতী হইয়া আমি উক্ত অনিবারিণী ইচ্ছার অনুগামী হইয়া নিজেই তাহার ব্যয়ভার বহন করিতে কৃতসংকল্প হইলাম এবং লজ্জা ও অভিমান পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে ধারণ করিলাম। পুস্তকালয়ের সাহায্যে দুই বৎসর গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে 'গ্রামবার্ত্তা' এবং তদ্ব্যতীত 'চারুচরিত্র' নামক একখানি পুস্তক ছাপা করিয়া আমি তাহার নিকট পরিচিত ও বিশ্বস্ত হইয়াছি। সুতরাং তৃতীয় বৎসরের নিমিত্ত গ্রামবার্ত্তার কার্য্য আরম্ভ করিতে আশু টাকার প্রয়োজন হইল না।... [১৫২৭-২৮ পৃ.]

গ্রামবার্ত্তার প্রবন্ধাদি এবং আগত পত্রে সংবাদাদি বিচার ও সংশোধন করিয়া চারি ফরমার উপযুক্ত আদর্শলিপি অর্থাৎ কাপি হাতে লিখিয়া যথাসময়ে যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করা অল্প সময়ের প্রয়োজন নহে, ইহার পর মূল্যাদি আদায় ও অন্যান্য কারণে [১৪৩০ পৃ.] এবং পত্রপ্রেরক প্রভৃতি নানা লোকের নিকট পত্রাদিও সর্ব্বদা লিখিতে ও নিজের স্ত্রীপুত্রাদির রক্ষণাবেক্ষণ সাংসারিক কার্য্য প্রভৃতিতেও অনেক সময়ের আবশ্যক হইত।... অতএব আমি শ্যাম ও কুল উভয় রক্ষা করিতে না পারিয়া... পাঠশালার কার্য্যরূপে মাতৃভাষার সেবা হইতে অবসর গ্রহণ করিলাম এবং গ্রামবার্ত্তা প্রচারে গ্রামবাসী ও মাতৃভাষার সেবা করিতে ব্রতপরায়ণ হইলাম। জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত পাঠ্য

পুস্তকাদি বিক্রয়ের পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলাম। [১৪৩২ পৃ.]

আমি এইরূপে গ্রামবার্ত্তা প্রকাশের দ্বারা গ্রামবাসী ও গ্রামবার্ত্তার সেবা করিতেছি। গ্রামবার্ত্তার তৃতীয় বৎসর অনায়াসে অতিবাহিত হইল। চতুর্থ বৎসরে পত্রদ্বারা অবস্থা অবগত করিয়া গ্রাহকগণের নিকট প্রাপ্য মূল্য আদায় ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিল। এক দিন দুই দিনের দূরবর্ত্তী স্থানে নিজেই গমন করিয়া মূল্য আদায় করিতে লাগিলাম। তৎসঙ্গে দুই এক জন গ্রামবৎসল ব্যক্তি নূতন গ্রাহকও হইতে লাগিলেন। আমিই লেখক, আমিই সম্পাদক, আমিই পত্রিকা লেফাফা ও বিলিকারক এবং আমিই মূল্য আদায়কারী অর্থসংগ্রাহক। আবার আমিই আমার স্ত্রীপুত্রাদি সংসারের সংসার"। দীনজনের দীনতার দিন এই ভাবে দিন দিন গত হইতেছে। [১৬৩২ পৃ.]

· এত দিনে ক্রমান্বয়ে অনেকে বুঝিতে পারিলেন, পূর্ব্বে অনেক ধনবানাদি সবল লোকেরা দুর্ব্বলের প্রতি প্রকাশ্যরূপে সহসা যে প্রকার অত্যাচার করিতেন, এক্ষণে সে তদ্রূপ করিতে সাহসী হইতেছেন না,···গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকাই তাহার কারণ। অতএব ন্যায়বান্ কতিপয় গ্রামবাসী গ্রামবার্ত্তার উন্নতির নিমিত্ত একটি ভবন-সভা করিয়া মাসিক গ্রামবার্ত্তাকে পাক্ষিকরূপে প্রকাশ করিতে বলিলেন এবং আপনারা সাধ্যানুসারে দুই শত হইতে দশ টাকা পর্য্যন্ত একদা দান অঙ্গীকারপূর্ব্বক দানপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। আমি তাঁহাদিগের আদেশ অনুসারে······ [১২৭৪ ?] সালের বৈশাখ মাস হইতে গ্রামবার্ত্তা পক্ষান্তরে প্রচার করিয়া তাহার কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলাম।

[১৪৪২ পৃ.] প্রায় দুই মাস গত হইল কেহই টাকা আদায় করিলেন না। আমি ঘোর বিপদে পতিত হইয়া "কিরূপে গ্রামবার্ত্তার জীবনরক্ষা হইবে" অনন্যমনস্ক হইয়া দিবারাত্রি যে প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলাম, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানলাভের নিমিত্ত চিন্তা করিলে তত্ত্বজ্ঞানী হইতে পারিতাম সন্দেহ নাই। কুমারখালীনিবাসী রাধাগোবিন্দ মজুমদারের নিকট হইতে ১০০৲ এক শত টাকা হাওলাত লইয়া উপস্থিত বিপদের আশু প্রতিকার করিলাম। কতক দিন পরে যিনি ২০০৲ দুই শত টাকা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তিনি এক শত আদায় করিলে আশু ঋণ পরিশোধ হইল। কিন্তু এই এক শত টাকা ব্যতীত, যিনি ২০০৲ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, [১৪৪৩ পৃ.] তিনি যেমন অবশিষ্ট টাকা দিলেন না, তদ্রূপ অন্য স্বাক্ষরকারিগণ বিন্দুবিসর্গও আদায় করিলেন না। সুতরাং কিরূপে গ্রামবার্ত্তার জীবন থাকিবে এই এক বৎসর সেই চিন্তায় অনেক রাত্রি অনিদ্রায় গত হইতে লাগিল। উক্ত প্রকার চিন্তার পর, কোথা হইতে কোন বিষয়ে কি প্রকারে প্রয়োজন সাধন হইয়া গ্রামবার্ত্তার জীবন রক্ষা করিয়াছে, সে সমুদায় ধারাবাহিকরূপে এক্ষণে আমার স্মরণ নাই। তবে এ স্থলে কেবল এইমাত্র বলিতেছি, গ্রামবাসীদিগের হিতৈষী অনেক ধনাঢ্য লোকের বার্ষিক ও একদা দানে পাক্ষিকের পর গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা ১২৭৭ সালের বৈশাখ মাস হইতে সাপ্তাহিকরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। যখন গ্রামবার্ত্তা মাসিক ছিল, তখন ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি সাহিত্যময় প্রবন্ধ এবং রাজনীতিময় প্রস্তাব, গ্রামের ঘটনাময় সম্বাদ সহকারে গ্রামবাসীদিগের জ্ঞাতব্য বাজার অভিপ্রায়, মন্তব্য ও বিবিধ

সংবাদ প্রকাশিত হইত পাক্ষিকাবস্থায় ধর্মনীতি সাহিত্য ব্যতীত পূর্ব্ববৎ আর সকলেরই [১৪৪৭ পৃ] প্রচার হইয়াছে। সাপ্তাহিকাবস্থায় সাহিত্যময় প্রবন্ধাদি প্রচার রহিত হইয়া বাহুল্যরূপে রাজনীতিরই আলোচনা হইতে লাগিল। কিন্তু সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানাদি আলোচনার নিমিত্ত স্বতন্ত্ররূপে একখানি মাসিক গ্রামবার্ত্তাও প্রকাশিত হইত। [১৪৪৫ পৃ.] ...

কেবল সংবাদদাতা, পত্রপ্রেরক ও শ্রুতিকথার প্রতি নির্ভর করিয়া গ্রামবার্ত্তার প্রকাশ হইত না। আমরা গ্রামবার্ত্তার উপযুক্ত বার্ত্তা জানিবার নিমিত্ত কখনও গোপনে কখনও প্রকাশ্যে নানা স্থান পরিদর্শন ও দূরস্থ গ্রামপল্লী অবসর মত সময়ে সময়ে ভ্রমণ করিয়াছি এবং এই প্রকার ভ্রমণ করিয়া শান্তিপুর, উলাদি উপনগর পরিদর্শনে তাহার নামোৎপত্তির কারণ ও প্রাচীন বৃত্তান্ত এবং মেহেরপুর, চাকদহ ও উলা প্রভৃতি স্থানের মহামারীর অবস্থা অনেক সংগ্রহ করিয়াছিলাম। উক্ত উপায়ে নিজে যাহা সংগ্রহ করি ও হিমালয় প্রভৃতি নানা দিক্ দর্শন করিয়া ভ্রমণকারিগণ যাহা সংগ্রহ করিতেন, তাহা সমস্তই মাসিক গ্রামবার্ত্তায় প্রকাশিত হইত। নানা প্রদেশের ভ্রমণবৃত্তান্ত গ্রামবার্ত্তায় প্রকাশিত হইয়া গ্রাম ও পল্লীবাসীদিগের যত দূর উপকার সাধন করিয়াছিল, আমি তত দূর অত্যাচারী লোকের বিষনেত্রে পড়িয়া নানা প্রকারে উৎপীড়িত ও অত্যাচরিত হইতে লাগিলাম। [১৪৬২-৩ পৃ.] ... ...

চারি দিকে পুস্তক বিক্রয়ের দোকান যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, আমার জীবিকার স্বরূপ পুস্তকালয়ের আয় ক্রমে অল্প হইয়া আসিল। যদি গ্রামবার্ত্তার প্রতি উক্ত ভার অর্পণ করি,

তবে সে চলিতে পারে না, নিজের ভার নিজে বহন করিবারও আর কোন প্রকার উপায় নাই।...এই সময়ে রংপুর তুষভাণ্ডারের রাজা রমণীমোহন রায় চৌধুরীর দান [মাসিক ১০৲] রহিত হওয়ায় মাসিক গ্রামবার্ত্তা বন্ধ হইয়াছিল। [১৪৯১ পৃ.]...

রাজীবলোচন মজুমদার আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ সারগ্রাহী পরম বৈষ্ণব কুঞ্জবিহারী মজুমদারের প্রপৌত্র। রাজীবলোচন মজুমদার আমার ছাত্র কৃষ্ণচন্দ্র মৈত্রের মুখে শুনিয়াছিলেন, একটি প্রেস অর্থাৎ মুদ্রাযন্ত্র হইলে কুমারখালী সংবাদপত্রিকা 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' ইহা অপেক্ষা ভালভাবে চলিতে পারে এবং উক্ত প্রেস ধরিয়া আমাদিগের ন্যায় অন্যান সাত আটটি পরিবার অনায়াসে অন্ন সংগ্রহ করিতে পারে। তিনি বৃন্দাবন-গমনের সময় কলিকাতায় কয়েক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। [১৬৭৩ পৃ.] সেই সময় গ্রামবার্ত্তার প্রেস ক্রয় করিতে আমার নিমিত্ত ৬০০৲ ছয় শত টাকা...আমার খুড়া নবীনচন্দ্র সাহার নিকটে রাখিয়া গিয়াছিলেন।...উক্ত টাকায় প্রেস করিবার নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনে পত্র লিখিয়া তাঁহার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তদুত্তরে তিনি লিখিলেন, "উক্ত টাকা প্রেস করিবার নিমিত্ত আমি তোমাকে দান করিয়াছি। তুমি প্রেস স্থাপন করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের কথানুসারে যত জন নিরন্ন দুঃখী পরিবার প্রতিপালনে এবং ভালরূপে গ্রামবার্ত্তার কার্য্য চালাইতে পারিবে, আমি তোমার প্রতি ততই সন্তুষ্ট হইব।" আমি উক্ত পত্রানুসারে টাকার অধিকারী হইলে [১৬৭৪ পৃ.] 'মথুরানাথ-যন্ত্র'* নামে এই বর্ত্তমান প্রেসটি,

* ইহা ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২৮০ সালের ১৭ই শ্রাবণ তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় এই মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের উল্লেখ আছে।—ব্র. না. ব.

তৎকালে কলিকাতাস্থ বন্ধুগণ ক্রয় করিয়া পাঠান [১৬৭৫ পৃ.] ·

আমি প্রেস স্থাপন ও তাহা হইতে গ্রামবার্ত্তা প্রকাশ এবং নিজ পরিবার ও প্রেসের কর্ম্মচারী অন্য ৬-৭টি পরিবারের অন্ন সংগ্রহ করিয়া খুড়া রাজীবলোচন মজুমদারের আদেশ পালন করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার অর্থকৃচ্ছ্রতা পূর্ব্বে যেমন ছিল, তাহা অপেক্ষা বরং ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পূর্ব্বে কেবল গ্রামবার্ত্তার নিমিত্ত চিন্তা ছিল, এখন তৎসঙ্গে প্রেস চালাইবার চিন্তা উপস্থিত হইল। [১৬৮১ পৃ.] ·

আমি প্রেস স্থাপন ও কতিপয় বৎসর গ্রামবার্ত্তার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ক্রমেই ঋণগ্রস্ত হইতে লাগিলাম,—দেখিয়া আমার ছাত্র কুমারখালীর বাঙ্গলা পাঠশালার পূর্ব্ব শিক্ষক প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও আর কয়েক জন বন্ধুবান্ধব, আমার হস্ত হইতে 'গ্রামবার্ত্তা' গ্রহণ এবং তাহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কয়েক বৎসর কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে, আমি পরে কাগজ পত্র আলোচনা করিয়া দেখিলাম, পূর্ব্ব ও পরে একত্রিত হইয়া সর্ব্বসুদ্ধ ১২০০৲ বার শত টাকা ঋণ হইয়াছে। এদিকে আমার শরীর ক্রমেই বার্দ্ধক্য জরার নিকটবর্ত্তী হইতেছে। অতএব, আর ঋণবৃদ্ধি হওয়া উচিত হয় না মনে করিয়া গ্রামবার্ত্তার কার্য্য বন্ধ করিয়া দিলাম। * [১৬৮৪ পৃ.] †

---

* মাসিক 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' ১২৮৮ সালের চৈত্র সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্ত্তা' প্রথম বন্ধ হয় ১২৮৬ সালে। ১২৮৯ সালের বৈশাখ মাসে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, জলধর সেন প্রভৃতির পরিচালনে ইহা পুনঃপ্রকাশিত হইয়া ১২৯১ সালের আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।—ব্র. না. ব.

† কাঙ্গাল হরিনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মজুমদার কাঙ্গালের ডায়েরী হইতে উদ্ধৃত অংশ আমাকে ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছেন, এজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

পত্রিকা-সম্পাদনে হরিনাথের নির্ভীকতা ও সত্যবাদিতা আদর্শ ছিল। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখিয়াছেন ঃ—

হরিনাথের গ্রামবার্ত্তা সত্য সত্যই দেশের মধ্যে "দোষ-প্রদোষধ্বান্তচন্দ্রিকা" হইয়া উঠিল। ইহাতে দেশের অনাথ প্রজাপুঞ্জের উপকার হইতে লাগিল, কিন্তু অনেকে হরিনাথের শত্রু হইয়া উঠিলেন। হরিনাথ যেরূপ নির্ভীকভাবে "দোষপ্রদোষ" বিধ্বংস করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পরগণার জমিদার, উভয়েই খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। হরিনাথকে হস্তগত করিবার জন্য অর্থলোভন ও তর্জ্জন গর্জ্জন প্রদর্শনের কিছুমাত্র ক্রটি হইল না। অবশেষে হরিনাথ গ্রামবার্ত্তায় লিখিলেন,—

"মাতৃ ও পিতৃভক্ত কোন ব্যক্তিকে কেহ যদি বলে, তুমি তোমার পিতামাতার সেবা পরিত্যাগ কর, যদি না কর তবে দণ্ডিত হইবে। এই দণ্ডভয়ে কি কেহ পিতা মাতার সেবা পরিত্যাগ করিতে পারেন? সত্যপালনই জগৎপিতার সেবা করিবার উপায়, এই সত্য পালন করিয়া জগৎপিতার সেবা করিতে যদি কেহ দণ্ড করেন, তাহা হইলে কি আমরা তাঁহার সেবা পরিত্যাগ করিব? অতএব যাঁহারা নূতন আইনের কথা শুনিয়া গ্রাম ও পল্লীবাসীদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে বলিতেছি, ভ্রাতৃভাবে বিনয় করিয়া বলিতেছি, অত্যাচার পরিত্যাগ করুন। তাঁহার নিরীহ ও দুর্ব্বল সন্তানগুলি অত্যাচরিত না হয়, ঈশ্বর এই নিমিত্ত

ভারত রাজ্য ব্রিটিশ সিংহের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন অত্যাচার করিয়া এক দিন, না হয় দু দিন পার পাইবে, তিন দিনের দিন অবশ্যই তাহা রাজার কর্ণগোচর হইবে। আমরা এত দিন সহ্য করিয়াছি, আর করিতে পারি না। সকল কথা প্রকাশ করিয়া কর্তব্য সম্পাদন করিতে ত্রুটি করিব না। ইহাতে মারিতে হয় মার, কাটিতে হয় কাট, যাহা করিতে হয় কর, প্রস্তুত আছি। ধর্মমন্দিরে ধর্মালোচনা আর বাহিরে আসিয়া মনুষ্যশরীরে নিরপরাধে পাদুকা-প্রহার, এ কথা আর গোপন করিতে পারিব না। ব্রিটিশরাজ্যের প্রতি এই অত্যাচার দেখিয়া যে প্রকাশ না করে, আমাদিগের মতে সেই রাজদ্রোহী।”

হরিনাথ স্বদেশ সেবার জন্য জীবন দান করিতে প্রস্তুত হইলেও জমিদার লজ্জিত হইলেন না, তাহাকে নির্যাতন করিবার জন্য পঞ্জাবী ‘গুণ্ডা” পর্যন্ত নিযুক্ত হইল। অবশেষে কাঙ্গাল হরিনাথেরই জয় হইল। কুমারখালীতে ছাপাখানা সংস্থাপন করিয়া এক পয়সা মূল্যে হরিনাথ গ্রামবার্তা বিক্রয় করিতে লাগিলেন, কাঙ্গাল হইয়াও প্রজাসমাজে হরিনাথই রাজা হইয়া উঠিলেন।

যত দিন “গ্রামবার্ত্তা” জীবিত ছিল, প্রায় তত দিনই কোন-না-কোনরূপে হরিনাথকে জমিদারের উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইত। ১২৮৫ সালের ২১ চৈত্র তারিখের একখানি স্বহস্তলিখিত পত্রে হরিনাথ তাঁহার কোনও স্নেহভাজন সাহিত্যসেবক প্রিয় শিষ্যকে লিখিয়া গিয়াছেন যে,—

“জমিদারেরা প্রজা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতি

যত দূর সাধ্য অত্যাচার করেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, পরিশেষে অত্যাচারের হাত খর্ব্ব করিয়া আনিয়াছেন। এখন আর তাঁহাদিগের অত্যাচারের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। গ্রামবার্ত্তা যথাসাধ্য প্রজার উপকার করিয়াছে। পরে কি ঘটে, বলিতে পারি না।

জমিদারেরা যখন আমার প্রতি অত্যাচার করে, এবং আমার নামে মিথ্যা মোকদ্দামা উপস্থিত করিতে যত্ন করে, আমি তখন গ্রামবাসী সকলকেই ডাকিয়া আনি এবং আত্মাবস্থা জানাই। গ্রামের একটি কুকুর কোন প্রকারে অত্যাচরিত হইলেও গ্রামের লোকে তাহার জন্য কিছু করে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ও আমার এত দূরই দুর্ভাগ্য যে, আমার জন্য কেহ কিছু করিবেন, এরূপ একটি কথাও বলিলেন না। যাঁহাদের নিমিত্ত কাঁদিলাম, বিবাদ মাথায় করিয়া বহন করিলাম, তাহাদিগের এই ব্যবহার!”

যে জমিদারের অত্যাচারে হরিনাথ এরূপ সকরুণ আর্ত্তনাদ করিয়া গিয়াছেন, কোনও স্থানে তাঁহার নামোল্লেখ করেন নাই। আকারে ইঙ্গিতে যাহা জানাইয়া গিয়াছেন, তাহাতে যাঁহাদিগের কৌতূহল দূর হইবে না; আমরা তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে অসমর্থ। হরিনাথ যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সুতীব্র সমালোচনায় রাজদ্বারে পল্লীচিত্র বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তিনি এ দেশের সাহিত্যসংসারে এবং ধর্ম্মজগতে চিরপরিচিত;—তাঁহার নামোল্লেখ করিতে হৃদয় ব্যথিত হয়, লেখনী অবসন্ন হইয়া পড়ে!—‘সাহিত্য’, বৈশাখ ১৩০৩।

রচনাবলী

হরিনাথ আমরণ লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে অনেকগুলি পৌরাণিক নাটক, গীতাভিনয় ও পাঁচালি আছে। এগুলি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল। হরিনাথ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদের অভাবে অনেক সময় গ্রামের যুবকগণ বিপথে বিচরণ করিয়া থাকে; তাহাদের উদ্ধারের জন্যই তিনি এই সকল নাটক গীতাভিনয় ও পাঁচালি রচনা করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই শিক্ষা দিয়া যুবকদের দ্বারা এগুলি অভিনয় করাইতেন, কখন বা পাঁচালির দল করিয়া গান করিতেন। ইহা দ্বারা হরিনাথ গ্রামের মধ্যে ধর্ম্মভাব ও সুনীতি বিস্তারের যথেষ্ট সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত সঙ্গীতের—বিশেষতঃ বাউল-সঙ্গীতের সংখ্যাও বড় কম নহে। 'ভারতীয়-সঙ্গীত-মুক্তাবলী'তে বাংলা গীতিকবিতার নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহার রচিত অনেকগুলি সঙ্গীত স্থান লাভ করিয়াছে।

হরিনাথ যে-সকল পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেগুলির একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। এই পুস্তক-পুস্তিকার সকলগুলি বর্ত্তমানে সংগ্রহ করা দুরূহ। বিজ্ঞাপনে কয়েকখানির নাম পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রকাশকাল জানা যায় নাই। হরিনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র, কুমারখালী-নিবাসী শ্রীভোলানাথ মজুমদার কয়েকখানি পুস্তকের প্রকাশকাল

আমাকে জানাইয়াছেন, তিনিও সকল পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

১। **বিজয়-বসন্ত।** (নীতিগর্ভ উপাখ্যান) ১৭৮১ শক (ইং ১৮৫৯)। পৃ. ১০৫।

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের এক খণ্ড ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে। ইহার বহু সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ৯ম সংস্করণ হইতে রচনার নিদর্শন-স্বরূপ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

স্বামী স্ত্রীর পরমারাধ্য ও পরম গুরু। এই ভূমণ্ডলে স্বামী ভিন্ন স্ত্রীর আর অন্য গুরু নাই। স্ত্রী স্বামী ভিন্ন অন্য গুরু কর্তৃক উপদিষ্টা হইলে, সকল ধর্ম্ম হইতে পতিতা হয়েন। স্ত্রী ছায়াতুল্য স্বামীর অনুগতা, ও সখীতুল্য তাহার প্রিয়কার্য্য সাধনে যত্নবতী হইবেন। সদা প্রিয়বাদিনী ও সদাচারা, এবং সংযতেন্দ্রিয়া হইয়া সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহে যত্নযুক্তা হইবেন। কখন প্রলাপবিলাপিনী বা ধর্ম্মকর্ম্মে বিরোধিনী হইবেন না। ভ্রমেও অন্য পুরুষকে মনে স্থান দিবেন না। পতি ভিন্ন অন্যের উপদেশে অবহেলা করিবেন। কেন না, এ দেশীয় ছদ্মবেশী অনেক ধার্ম্মিক উপদেশের ছলনায় অনেক অবলার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। সতী স্ত্রী, যে স্থলে পতিনিন্দা অথবা অসৎ বিষয়ের আলোচনা হইবে তথায়, কি সখীর আলয়, কি গুরুজনগৃহ, এমত স্থানে তিলার্দ্ধ কালও থাকিবেন না। আপনার অন্তঃকরণে যে সকল ভাবের উদয় হইবে, পতির নিকটে তৎসমুদায় সম্পূর্ণ প্রকাশ করিবেন, কদাচ গোপন রাখিবেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে পতি যদি জড়, রোগী, অধন অথবা মূর্খ হয়েন, তথাপি পরিত্যাগ

করিবেন না। পতি ব্যভিচারাক্রান্ত হইলেও উগ্রবাদিনী না হইয়া সহজ কৌশলে নিবারণ করিতে যত্নবতী হইবেন, নতুবা পুরুষ যেমন ব্যভিচারিণী পত্নীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, স্ত্রীও ব্যভিচারাক্রান্ত পুরুষকে ত্যাগ করিলে শাস্ত্র বা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ অপরাধিনী হন না। সর্ব্বদা পতি জ্ঞান, পতি ধ্যান, পতি প্রাণ, পতি পরম গুরু, পতিসেবাই পরম ধর্ম্ম, পতিসন্তোষই পরম সন্তোষ। সাধ্বী স্ত্রী দেবতাদিগের আদরণীয়া। ইনি ইহলোকে পরম সুখ সম্ভোগ করেন এবং পরকালে স্বর্গবাসিনী হয়েন। ইহা ভিন্ন সকল স্ত্রীই পরকালে নরকগামিনী হয় সন্দেহ নাই। (পৃ. ১৪০-৪১)

২। **পদ্মপুণ্ডরীক**। (পদ্য) ১২৬৯ সাল (ই° ১৮৬২)। পৃ. ৪২।

বালকপাঠ্য। ২৯ পৌষ ১২৬৯ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' সমালোচিত। ইহার কয়েক পংক্তি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল —

নাশের হেতু

রাজ্য-নাশ হেতু, রাজ অবিচার।
কার্য্য-নাশ হেতু, আলস্য সবার॥
বুদ্ধি-নাশ হেতু, মাদক-সেবন।
ঋদ্ধি-নাশ হেতু, জ্ঞাতি-বিরোধন॥
স্বাস্থ্য-নাশ হেতু, রাত্রি-জাগরণ।
কান্তি-নাশ হেতু, অমূল-চিন্তন॥
মান-নাশ হেতু, মিথ্যা-আচরণ।
প্রাণ-নাশ হেতু, রিপু-পরায়ণ॥

সুখ-নাশ হেতু, পর-সুখে দাহ।
সর্ব্বনাশ-হেতু, বালক-বিবাহ ॥

৩। **চারুচরিত্র**। ২৬ বৈশাখ ১২৭০ (ইং ১৮৬৩)। পৃ. ১০৫।

বালক-পাঠ্য। ইহাতে দ্বাদশ শিশুর চরিত্র নানাবিধ ছন্দে রচিত হইয়াছে। প্রথম শিশু—অসাধারণ অধ্যবসায় ও গুরুভক্তিপরায়ণ নিষাদপুত্র বটু। দ্বিতীয় শিশু—রণনিপুণ অভিমন্যু। তৃতীয় শিশু—মাতৃভক্তিপরায়ণ ধ্রুব। চতুর্থ শিশু—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কচ। পঞ্চম শিশু—সূর্য্য-কুল-তিলক ভগীরথ। ষষ্ঠ শিশু—ক্ষমাশীল সিন্ধু। সপ্তম শিশু—ন্যায়পরায়ণ প্রহ্লাদ। অষ্টম শিশু—পিতৃভক্তিপরায়ণ পুরু। নবম শিশু—পিতৃভক্তিপরায়ণ বৃষকেতু। দশম শিশু—কৃষ্ণ ও বলরাম। একাদশ শিশু—তত্ত্বজ্ঞানী নিমাই। দ্বাদশ শিশু—পরাক্রমবিশিষ্ট লব ও কুশ।

এই পুস্তকখানি প্রথমে **'দ্বাদশ শিশুর বিবরণ'** নামে প্রকাশিত হয়। ইহার এক খণ্ড উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরিতে আছে; পুস্তকের ভামকার তারিখ—"কুমারখালি ১২৬৯ সাল মাঘ।" পুস্তকখানিতে বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি দোষ থাকায় উহা পরবর্ত্তী বৈশাখ মাসে 'চারুচরিত্র' নামে পুনর্মুদ্রিত হয়। 'চারুচরিত্রে'র "বিজ্ঞাপন" অংশে প্রকাশ:—

> আমি উৎকট রোগাক্রান্ত হওয়ায়, এই পুস্তকের সংশোধন ভার জ্ঞানরত্নাকর-পত্র সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনচন্দ্র বসাক মহাশয়ের প্রতি অর্পণ করিয়াছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এবং আমার দুঃসময়প্রযুক্ত সংশোধন করা দূরে থাকুক, বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি নূতন কতকগুলি দোষ

> সংযোজিত হয়, সুতরাং উক্ত মুদ্রিত পুস্তক আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার মুদ্রিত করাইতে হইয়াছে। ·
>
> এই পুস্তক প্রথমে "দ্বাদশ শিশুর বিবরণ" নামে প্রকাশিত হয় অনন্তর উক্ত দোষাশ্রিত হওয়ায়, তৎপরিবর্ত্তে চারুচরিত্র নামকরণ করিয়াছি।...সন ১২৭০ সাল তা ২৮ বৈশাখ।

'চারুচরিত্র' পুস্তকের এক খণ্ড কলিকাতা ইউনাইটেড বিড়ি' কম্‌সে আছে।

৪। **কবিতাকৌমুদী।** মাঘ ১২৭২ (ইং ১৮৬৬)। পৃ. ৪৪।

বালকপাঠ্য। কলিকাতা ইউনাইটেড বিড়ি কম্‌সে ইহার এক খণ্ড আছে।

৫। **বিজয়া।** (পাঁচালি) ইং ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯। পৃ. ৩০।

ইহা "গোবিন্দচন্দ্র চাকী-সম্পাদিত'।

৬। **কবিকল্প।** (দক্ষযজ্ঞ বিষয়ক কাহিনী) ইং ১৮৭০। পৃ. ৫৮।

৭। **অক্রূরসংবাদ।** (গীতাভিনয়) বৈশাখ ১২৮০ (ইং ১৮৭৩)। পৃ. ৪৭।

ইহা "'কবিকল্প' পুস্তকাবলম্বনে নাটকাকারে যাত্রা বা গীতাভিনয়"। ইহার প্রকাশক—কুমারখালীর বাজারস্থ গীতাভিনয় সভার অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার পাল—"বিজ্ঞাপনে" লিখিয়াছেন :—

> শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরিনাথ মজুমদার মহাশয়, আমাদিগের অনুরোধে যে কয়েক খানি "গীতাভিনয়" প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, আমি তাহা

ক্রমান্বয়ে মুদ্রাঙ্কণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। এবারে "অক্রূর সম্বাদ" গীতাভিনয় পুস্তক মুদ্রিত হইল।

পুস্তকের "নান্দী" অংশ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

রাগিণী স্বরট, তাল ঝাঁপতাল।

মন ভজ রে নিত্য নিত্য, সত্য সনাতন নিত্য,
সত্য বিনে শান্তি নাই আর জেন এই সত্য সত্য।
সত্যসেবায় আত্মশুদ্ধি, দূরে পলায় ভ্রমবুদ্ধি,
সত্যতত্ত্বে জ্ঞানবৃদ্ধি স্বপ্রকাশ্য আত্মতত্ত্ব॥
(ওরে) লইলে সত্যের শরণ, অহংকার না থাকে কখন,
দ্বেষ হিংসা কাম ক্রোধ দূরে করে পলায়ন।
সত্যকে রাখিলে হৃদে, ডোবে না জীব পাপহ্রদে,
সত্য কলুষ সংহারে, প্রকাশে বিভুমাহাত্ম্য॥
(ওরে) সত্য ভিন্ন ধর্ম্মকর্ম্ম, ধর্ম্ম নয় সে ধর্ম্ম মর্ম্ম
ভেদ করা কলুষ অস্ত্রে মনে জেন নিশ্চয়।
শুন ওরে ভ্রান্ত মন, সত্য পথে কর ভ্রমণ,
ষড় রিপু হবে দমন, পাবে পরম পদার্থ॥

* * *

সূত্রধার।... গ্রামমণ্ডলীতে আজকাল শ্রীমদ্ভাগবতের বড় সমাদর। বৈষ্ণব মাত্রেই তাহার প্রতি ভক্তিমান, অতএব মহারাজ কংসের ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান হতে, অক্রূরসংবাদ পর্য্যন্ত অভিনয় করা যাক, তাতে অনেকের সন্তোষ সাধন হতে পারে।

এই পুস্তকের এক খণ্ড কলিকাতা ইউনাইটেড রিডিং রুম্‌সে আছে।

৮। **সাবিত্রী নাটিকা।** (গীতাভিনয়) ১২৮১ সাল। পৃ. ৯০।

৯। **চিত্তচপলা।** (উপন্যাস) বৈশাখ ১২৮৩ (ইং ১৮৭৬)। পৃ. ১৪৮।

"জ্ঞাতিবিরোধীয় অপূর্ব্ব উপন্যাস"। কলিকাতা ইউনাইটেড রিডিং রুমসে ইহার এক খণ্ড আছে।

১০। **একলভ্যের অধ্যবসায়।**

বালক-পাঠ্য। ইহা ১২৮১ সালের পরে প্রকাশিত।

১১। **ভাবোচ্ছ্বাস।** (নাটক)

ইহা ১২৯১ সালের পরে প্রকাশিত।

১১। **কাঙ্গাল-ফকিরচাঁদ ফিকীরের গীতাবলী।** ১২৯৩-১৩০০ সাল।

এগুলির ১৬টি খণ্ড প্রথমে খণ্ডশঃ ১২ পৃষ্ঠা হিসাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম ১২টি খণ্ড একত্র "প্রথম ভাগ"-রূপে ১২৯৪ সালের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয়, ইউনাইটেড রিডিং রুমসে ইহা আছে। দ্বিতীয় ভাগের চারিটি খণ্ড (১৩-১৬) শেষ বা, চতুর্থ খণ্ডটি ১৩০০ সালের চৈত্র মাসে প্রকাশিত হয়। এই 'গীতাবলী'তে অপরের রচিত কতকগুলি গানও স্থান পাইয়াছে।

কাঙ্গালের মৃত্যুর পর—২৯ জানুয়ারি ১৯০৪ তারিখে এই গীতাবলী 'কাঙ্গাল-ফিকিরচাঁদ ফকীরের বাউল সঙ্গীত' (পৃ. ২৩০) নামে প্রকাশিত হয়।

১৩। **ব্রহ্মাণ্ডবেদ।** ১২৯৪-১৩০২ সাল।

ইহার ছয়টি ভাগ প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক ভাগ দ্বাদশ সংখ্যায় সম্পূর্ণ।

১৪। **কৃষ্ণকালী-লীলা**। (পাঁচালি) ১২৯৯ সাল। পৃ. ৩৮।

১৫। **অধ্যাত্ম-আগমনী**। ১৩০২ সাল। পৃ. ২৪।

কলিকাতা ইউনাইটেড রিডিং রুম্‌সে ইহার এক খণ্ড আছে।

১৬-১৭। **আগমনী। পরমার্থ গাথা।**

এই দুইখানি সঙ্গীত-পুস্তক কাঙ্গালের সাধক-জীবনে—১২৯২ সালের পর রচিত ও প্রকাশিত হয়।

১৮। **মাতৃমহিমা**। ১৩০৪ সাল। পৃ. ৬০।

ইহা ১৩০২ সালে রচিত ও কাঙ্গালের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত।

* * *

এগুলি ছাড়া, হরিনাথ 'তৃতীয় ভাগ শিশুশিক্ষার অর্থসংগ্রহ'ও প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দেখিয়াছি।

হরিনাথ গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ। ১৩০৮ সাল। পৃ. ৩৩২।

ইহা বসুমতী-কার্য্যালয় হইতে জলধর সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সূচী :—কাঙ্গাল হরিনাথের জীবনী (সতীশচন্দ্র মজুমদার-লিখিত), পরমার্থ গাথা, বিজয় বসন্ত, দক্ষযজ্ঞ, বিজয়া, অক্রুর সংবাদ, ভাবোচ্ছ্বাস, ফিকিরচাঁদের বাউল সংগীত।

সাহিত্য-শিষ্যগণ

হরিনাথ নিজেই যে মাতৃভাষার সেবা করিয়া গিয়াছেন, তাহা নয়, তিনি অনেককে সাহিত্য-সেবা-ব্রতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহিত্য-শিষ্যগণের অনেকেই সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়,

দীনেন্দ্রকুমার রায়, জলধর সেন, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ও মীর মশার্‌রফ হোসেনের নাম করা যাইতে পারে। ইহাদের কেহই হরিনাথের সহানুভূতি ও উৎসাহলাভে বঞ্চিত হন নাই।

ফিকিরচাঁদের বাউল-সঙ্গীত

কৃতী শিষ্য—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, জলধর সেন, প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির হস্তে 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'-সম্পাদনের ভার দিয়া হরিনাথ অতঃপর সাধন-ভজনে মন দিলেন। এই সময় তিনি কুমারখালীতে একটি বাউলের দল গঠন করেন; এই দলের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়াই সাধারণের নিকট তিনি কাঙ্গাল হরিনাথ নামে পরিচিত। জলধর সেন 'কাঙ্গাল হরিনাথ' পুস্তকের ১ম খণ্ডে এই বাউলের দল প্রতিষ্ঠার যে ইতিহাস দিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> একবার গ্রীষ্মের অবকাশের সময় শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ভায়া বাড়ীতে (কুমারখালি) আসিয়াছেন। তিনি তখন বি. এল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। আমি তখন স্কুলমাষ্টার। আমারও গ্রীষ্মাবকাশ। আমরা তখন বাড়ীতে আসিয়া কাঙ্গালের বড় সাধের 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' পত্রিকার সম্পাদন করি, আর অবসর সময় আমোদ আহ্লাদে কাটাইয়া দিই।
>
> এই সময়ে একদিন মধ্যাহ্নকালে গ্রীষ্মের জ্বালায় অস্থির হইয়া, গ্রামবার্ত্তার 'কাপি' লেখা পরিত্যাগ করিয়া, আমরা হাত পা ছড়াইয়া বিশ্রাম করিতেছি। স্থান গ্রামবার্ত্তার আফিস,

অর্থাৎ কাঙ্গাল হরিনাথের চণ্ডীমণ্ডপের একটি কক্ষ। উপস্থিত শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার, গ্রামবার্তার প্রিণ্টার প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কুমারখালী বাঙ্গালা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং ছাপাখানার ভূতের দল। ভূতের দল ব্যাকরণ ও সাহিত্যে পণ্ডিত ছিল না, কিন্তু তাহারা সকলেই কাঙ্গালের শিষ্য, সকলেই গান করিতে পারিত। চুপ করিয়া শয়ন করিয়া থাকা আমাদের কাহারও কোষ্ঠীতে লেখে না। দ্বিপ্রহরে রৌদ্রের মধ্যে কি করা যায়, হঠাৎ একটা তর্ক আরম্ভ হইল। তর্ক বেশ চলিতে লাগিল, কিন্তু কর্ত্তব্য স্থির হইল না, তর্কের যাহা গতি হইয়া থাকে তাহাই হইল। অক্ষয় বলিলেন যে, "একটা বাউলের দল করিলে হয় না ?" এ কথাটা মনে হইবারও একটা কারণ ঘটিয়াছিল। সেদিন প্রাতঃকালে লালন ফকির ··কাঙ্গালের কুটীরে, আমরা যেদিনের কথা বলিতেছি, সেই দিন আসিয়াছিলেন এবং কয়েকটী গান করিয়াছিলেন।··· সকলেই তখন বলিয়া উঠিলেন "বেশ, বেশ।"

"বেশ, বেশ" বলাটা খুব সহজ, কিন্তু গান কোথায় ? বাউলের গান তখন তেমন প্রচলিত হয় নাই, ক্বচিৎ কখনও দুই একজন ফকির বা দরবেশের মুখে এক আধটা দেহতত্ত্বের গান আমরা শুনিয়াছি। সে সকল গান কাহারও মনে ছিল না। পণ্ডিত প্রসন্নকুমার বলিলেন "নূতন করিয়া গান প্রস্তুত করিতে হইবে।" অক্ষয়কুমার বলিলেন "তার জন্য ভয় কি ? ধর্ ত জলদা, কাগজ, বাউলের গানই লেখা যাক।" আমি তখন কাগজ কলম লইয়া বসিলাম। ·· অক্ষয়কুমার বলিলেন—

ভাব মন দিবানিশি, অবিনাশি, সত্য পথের সেই ভাবনা।
যে পথে চোর ডাকাতে, কোন মতে, ছোঁবে না রে সোনা দানা,

সেই পথে মনোসাধে চল্ রে পাগল, ছাড় ছাড রে ছলনা।
সংসারের বাঁকা পথে দিনে রেতে, চোর ডাকাতে দেয় যাতনা,
আবার রে ছয়টি চোরে ঘুরে ফিরে, লয় রে কেড়ে সব সাধনা।"

এই পর্য্যন্ত লেখা হইলেই অক্ষয় বলিলেন "এত দূর ত হোলো—তার পর?" তার পর—আবার কি? গানটা গাওয়া হবে। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন "কথাটা বুঝিলে না। বাউলের গানের নিয়ম হচ্চে এই যে, গানের শেষ একটা ভণিতা দিতে হয়। কেমন?" অক্ষয় বলিলেন "সেই কথাই ত ভাব্ছি।" ··· আমি বলিলাম "অত গোলে কাজ কি। গানটা নিয়ে কাঙ্গালের কাছে যাই, তিনি শেষ অন্তরা এবং ভণিতা ঠিক কোরে দেবেন।" অক্ষয় বলিলেন "তা হবে না; তাঁকে একেবারে Surprise (অবাক্) কোর্‌তে হবে। রও না, আমিই একটা নূতন নাম ঠিক কোরছি।" এই বলিয়া একটু মাথা চুলকাইয়া বলিলেন "লেখ জলদা:" আমি কলম ধরিলাম, অক্ষয় শেষ অন্তরা বলিলেন—

"ফিকিরচাঁদ ফকির কয় তাই, কি কর ভাই, মিছামিছি পর ভাবনা,
চল যাই সত্য পথে, কোন মতে, এ যাতনা আর রবে না।"

ব্যস্। গানের ভণিতা হইয়া গেল। সকলে একবাক্যে স্বীকার করিলেন "ফিকিরচাঁদ" নামটা ঠিকই হইয়াছে। আমাদের ত ধর্ম্মভাব ছিল না, কোনও "ফিকিরে" সময় কাটানই আমাদের উদ্দেশ্য। "ফিকিরচাঁদ" নামের ইহাই ইতিহাস!···

সেই দ্বিপ্রহরে আমাদের মজ্‌লিসে যখন গানের রিহর্সেল দেওয়া শেষ হইল, তখন স্থির হইল গানটা একবার কাঙ্গালকে শুনাইতে হইবে। আমরা সকলে তখন দল বাঁধিয়া বাড়ীর মধ্যে

কাঙ্গালের জীর্ণ খড়ের ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন কি যেন লিখিতেছিলেন। এত বড় একটা রেজিমেণ্টকে অসময়ে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "কি, তোদের আবার তর্ক বেধেছে না কি। তোদের জ্বালায় দেখ্‌ছি একটু স্থির হ'য়ে কাজ করবারও যো নেই। কি ব্যাপার বল্‌ ত?" তখন শ্রীমান্‌ অক্ষয় আমাদের মুখপাত্রস্বরূপ...বলিলেন "আমরা একটা বাউলের দল কোরবো। তার জন্য একটা গান লিখেছি।"

গানের কথা শুনিলে কাঙ্গাল সাত রাজার ধন হাতে পাইতেন। তিনি অমনি পরম উৎসাহে বলিলেন "গান লিখেচিস্‌? সুর বসানো হয়েছে?" প্রফুল্ল বলিলেন "সব হয়েছে, এখন শুধু আপনার শোনা বাকি।" তখন তিনি বলিলেন "বেশ, বেশ; সকলে মিলে গা দেখি।"

আমরা সকলে গান ধরিলাম। গানের মুখটুকু তিনি বসিয়া বসিয়াই শুনিলেন; তাহার পর যখন অন্তরা ধরা হইল, তখন আর তিনি বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া পড়িলেন। আমরা ত দাঁড়াইয়াই। তাহার পর গান আর নৃত্য—নৃত্য আর গান! সে এক অপার্থিব দৃশ্য!

শেষে গান থামিয়া গেলে কাঙ্গাল বলিলেন "দেখ, এই গানে দেশ ভেসে যাবে। তা একটা গান নিয়ে ত আর বাহির হওয়া যায় না। আমিও একটা গান দিই। অক্ষয়, কাগজ কলম ধর্‌ ত।"

তখন অক্ষয় কাগজ কলম ধরিলেন। কাঙ্গাল প্রথমে একটু গুণ গুণ করিয়া সুর ভাঁজিলেন; তাহার পর গাইতে লাগিলেন, অক্ষয় লিখিয়া লইতে লাগিল। তিনি গাইলেন—

"আমি কোরব এ রাখালী কত কাল।
পালের ছটা গরু ছুটে, কোরছে আমায় হাল-বেহাল।
আমি, গাদা কোরে নাদা পূরে রে, কত যত্ন ক'রে খোল বিচালি
খেতে দিই ঘরে,
তারা ছটা যে গুখেকো গরু রে; তারা, নবক খায় রে হামেহাল।
কাঙ্গাল কাঁদে প্রভুর সাক্ষাতে, তোমার রাখালী নেও আর পারিনে
গরু চরাতে;
আমি আগে তোমার যা ছিলাম হে, আমায় তাই কর দীনদয়াল।"

এইটি দ্বিতীয় গান। এই দুইটি গান লইয়া প্রথম প্রেসের ভূতেরা সন্ধ্যার সময় গ্রামে বাহির হইলেন। সেই নিদাঘের সন্ধ্যার সময়ে যখন আলখেল্লা পরিধান করিয়া, মুখে কৃত্রিম দাড়ী লাগাইয়া, নগ্নপদে গ্রামবার্ত্তার প্রেস হইতে ভূতের দল বাহির হইল এবং খঞ্জনী, একতারা ও গোপীযন্ত্র বাজাইয়া গান ধরিল—

"ভাব মন দিবানিশি—"

তখন সেই গান শুনিবার জন্য সমস্ত গ্রাম ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। বৃদ্ধেরা অশ্রুবর্ষণ করিলেন।··· কিন্তু দুইটি গানে লোকের পিপাসা মিটিল না;···তখন শ্রীমান্ অক্ষয়কে আরও গান বাঁধিবার জন্য বলা হইল; অক্ষয় অস্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন "আমি আর গান বাঁধিব না; দেখিতেছ না এ গানে শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে। এখন কাঙ্গাল ব্যতীত এ স্রোতের মুখে আর কেহ দাঁড়াইতে পারিবে না! এখন ইহার পশ্চাতে সাধনার বল থাকা চাই, নতুবা চলিবে না।"

অক্ষয় যখন জবাব দিলেন, তখন আমাদের ভূতের দলের সর্দ্দার প্রসিদ্ধ গায়ক···প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় অগ্রসর হইলেন;···

প্রফুল্ল পনর মিনিটের মধ্যে একটা গান বাঁধিয়া ফেলিলেন।···
গানটি এই—

"ভাবী দিন কি ভয়ঙ্কর, ভেবে একবার, দেখ্ রে আমার মন পামরা।

১। আত্মীয় ডাক্তার বদ্দি, নিরবধি, ঔষধ আদি দেবে তারা,
যখন তোর হাত ধরিতে, তর্জ্জনীতে, না করিবে নড়াচড়া।

২। যখন তোর সবশ অঙ্গ অবশ হয়ে, প'ড়ে রবে ধ'রে ধরা।
যখন তোর আত্মলোকে, ডেকেডুকে না পাইবে কথার সাড়া।

৩। যে গলার মধুর স্বরে, জগতেরে মাতাস ওরে ঘাটেপড়া,
তখন তোর সেই স্বরেতে থেকে থেকে রব করিবে ঘড়াৎঘড়া।

৪। তাই বলি, এই দেখি চল্ সত্যপথে নিত্য-নগরেতে মোর,
শুনেছি সেই ধামেতে এইরূপেতে মরে না যে মানুষ যারা।"

প্রফুল্লচন্দ্র এই গানটি রচনা করিলেন বটে, কিন্তু তিনি ইহাতে কোন ভণিতা দিলেন না।·· তৃতীয় দিনে যখন এই গানটি লইয়া ফকিরের দল গ্রামে বাহির হইলেন, তখন এই গান শুনিয়া লোকে একেবারে অধীর হইয়া গেল। কাঙ্গালের কুটীর হইতে গানের দল বাহির হইয়া যখন বাজারে পৌঁছিল তখন লোকারণ্য,···আমি অনেক দিন এমন জন-সমারোহ দেখি নাই। আর বলিতে কি, এমন প্রাণস্পর্শী গানও আমি কখনও শুনি নাই। এখনও আমার নয়নসম্মুখে সেই দৃশ্য বর্ত্তমান দেখিতেছি। সে আজকালকার কথা নহে। ফিকিরচাঁদ ফকিরের দল বাঙ্গালা ১২৮৭ সালে প্রথম গঠিত হয়।

এই ফিকিরচাঁদের গান সম্বন্ধে কাঙ্গাল হরিনাথ তাঁহার তৎসময়ের দিনলিপিতে যে কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা আমি এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। কাঙ্গাল লিখিতেছেন—

"শ্রীমান্ অক্ষয় ও শ্রীমান্ প্রফুল্লের গানগুলির মধ্যে আমি যে মাধুর্য্য পাইলাম, তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, এই ভাবে সত্য, জ্ঞান ও প্রেম-সাধনতত্ত্ব প্রচার করিলে, পৃথিবীর কিঞ্চিৎ সেবা হইতে পারে। অতএব কতিপয় গান রচনার দ্বারা তাহার স্রোত সত্য, জ্ঞান ও প্রেম-সাধনের উপায় স্বরূপ পরমার্থপথে ফিরাইয়া আনিলাম এবং ফিকিরচাঁদের আগে 'কাঙ্গাল' নাম দিয়া দলের নাম 'কাঙ্গাল-ফিকিরচাঁদ' রাখিয়া তদনুসারেই গীতাবলীর নাম করিলাম। কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ-ফকিরের দলস্থ গায়কেরা বাউল সম্প্রদায়ের ন্যায় বেশ ও পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া গান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। হৃদয় যতই পবিত্র হইতে লাগিল, ততই সত্য, জ্ঞান, ও প্রেমময় গীতি সকল উদ্ভাসিত হইয়া হৃদয়ক্ষেত্র সত্য, জ্ঞান, ও প্রেমানন্দে পূর্ণ করিতে লাগিল। দলস্থ যাহারা যতদূর পবিত্রতা রক্ষা করিতে লাগিলেন, তাঁহারা নিজ নিজ কৃত বিষয়ে ততদূর এক আশ্চর্য্য শক্তি লাভ করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই কাঙ্গাল-ফিকিরচাঁদের গান নিম্নশ্রেণী হইতে উচ্চ শ্রেণীর লোকের আনন্দকর হইয়া উঠিল। মাঠের চাষা, ঘাটের নেয়ে, পথের মুটে, বাজারের দোকানদার এবং তাহার উপর শ্রেণীর সকলেই প্রার্থনা সহকারে ডাকিয়া কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের গান শুনিতে লাগিলেন। কিন্তু নানা কারণে দেশস্থ কয়েক জন প্রধান ব্যক্তি বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন এবং নানা প্রকারে হৃদয়ে বেদনা প্রদান করিতে লাগিলেন। আমি একাকী সকল আঘাত সহ্য করিতে

লাগিলাম। তিলার্দ্ধ মাত্রও অবসর নাই। সংসারধর্ম্ম ও সংসারধর্ম্মের অতীত পরমার্থ পর্য্যন্ত, যিনি কেন যে কার্য্য না করুন, জগৎ তাহার প্রতিবাদ করিবে। প্রতিবাদ আছে বলিয়া এ জগতে এখনও কিছু দৃঢ়তা পবিত্রতা রহিয়াছে; অন্যথা ইহাও থাকিত না। কৃত কার্য্যে যতই প্রতিবাদ হইতে থাকে, কার্য্যে ততই স্বতঃ দৃঢ়তা জন্মে। যিনি ফিকির করিয়া, হাপরে স্বর্ণ দগ্ধ করিয়া খাঁটি করিবার জন্য আমাকে এইরূপ দগ্ধ করিতেছেন, বিরলে কেবল তাঁহাব উদ্দেশে ক্রন্দন করিয়া চক্ষের জলে বক্ষদেশ ভাসাইতে লাগিলাম।"

ফিকিরচাঁদের গান আর আমাদের ক্ষুদ্র কুমারখালী গ্রামে আবদ্ধ থাকিতে পারিল না।…সকলেরই অনুরোধ, তাহাদের গ্রামে একবার ফিকিরচাঁদের দলের পদার্পণ করিতে হইবে। শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার…রাজসাহী চলিয়া গেলেন। আমিও কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলাম।…আমরা তখন বাহিরে পড়িয়া গেলাম। ফিকিরচাঁদের গানের দলেব ব্যবস্থার ভার কাঙ্গালের উপরই পড়িল।…

এইরূপে বাউল-সঙ্গীতের স্রোত বহিতে লাগিল। নূতন নূতন গান রচনা করিয়া লোকের মন পরিতৃপ্ত করা এক হরিনাথেরই সাধ্য। "কাঙ্গাল" ভণিতায় হরিনাথ একাই অধিকাংশ গান রচনা করিতে লাগিলেন।

ফিকিরচাঁদের বাউল-সঙ্গীতগুলি সাধারণকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। এগুলি সহজ সরল ভাষায় রচিত ও

সাধারণের আয়ত্তাধীন সুরে গীত হইত। আমরা কয়েকটি বাউল-সঙ্গীত উদ্ধৃত করিতেছি :—

১

ওহে, দিন ত গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্ত্তা, শুনে বার্ত্তা, ডাক্‌ছি হে, তোমারে॥
আমি আগে এসে, ঘাটে রইলাম বসে
(ওহে, আমায় কি পার করবে নাহে, আমায় অধম বলে)
যারা পাছে এল, আগে গেল, আমি রইলাম পড়ে॥
যাদের পথ সম্বল, আছে সাধনার বল,
(তারা পারে গেল আপন আপন বলে হে।
(আমি সাধনহীন তাই রলেম পড়ে হে)
তারা নিজ বলে গেল চলে, অকূল পাথারে॥
শুনি, কড়ি নাই যার, তুমি কর তারেও পার,
(আমি সেই কথা শুনে ঘাটে এলাম হে)
(দয়াময়! নামে ভরসা বেঁধে হে)
আমি দীন ভিখারী, নাইক কড়ি, দেখ ঝুলি ঝেড়ে॥
আমার পারের সম্বল, দয়াল নামটি কেবল,
(তাই দয়াময় বলে ডাকি তোমায় হে)
(তাই অধমতারণ বলে ডাকি হে)
ফিকির কেঁদে আকুল, পড়ে অকূল সাঁতারে পাথারে॥

২

যদি ডাকার মত পারিতাম ডাক্‌তে।
তবে কি মা, এমন করে, তুমি লুকায়ে থাক্‌তে পারতে।

আমি নাম জানিনে, ডাক জানিনে,
আবার পারি না মা, কোন কথা বল্‌তে ,
তোমায়, ডেকে দেখা পাইনে তাইতে, আমার জনম গেল কান্‌তে ॥
দুঃখ পেলে মা, তোমায় ডাকি,
আবার, সুখ পেলে চুপ্ ক'রে থাকি ডাকৃতে ,
তুমি মনে বসে, মন দেখ মা, আমায় দেখা দাও না তাইতে ।
ডাকার মত ডাকা শিখাও,
না হয়, দয়া করে দেখা দাও আমাকে ,
আমি, তোমার খাই মা তোমার পরি, কেবল ভুলে যাই নাম করতে ॥
কাঙ্গাল যদি ছেলের মত,
মা তোর, ছেলে হ'ত তবে পারৃতে জান্‌তে
কাঙ্গাল, জোর ক'রে কোল কেড়ে নিত, নাহি সরৃত বল্লে সরতে ॥

৩

অরূপের রূপের ফাঁদে, পড়ে কাঁদে, প্রাণ আমার দিবানিশি ।
কাঁদলে নির্জ্জনে ব'সে, আপনি এসে, দেখা দেয় সে রূপরাশি ,
সে যে কি অতুল্য রূপ, নয় অনুরূপ, শত শত সূর্য্য শশী ।
যদি রে চাই আকাশে, মেঘের পাশে, সে রূপ আবার বেড়ায় ভাসি ,
আবার রে তারায় তারায়, ঘুরে বেড়ায়, ঝলক লাগে হৃদে আসি ।
হৃদয় প্রাণ ভরে দেখি, বেঁধে রাখি, চিরদিন সেই রূপশশী ,
তবে, তায় থেকে থেকে, ফেলে ঢেকে, কুবাসনা মেঘরাশি ।
কাঙ্গাল কয় যে জন মোরে, দয়া করে দেখা দেয় রে ভালবাসি ,
আমি যে সংসার মায়ায়, ভুলিয়ে তাঁয়, প্রাণ ভরে কৈ ভালবাসি ।

৪

দেখ ভাই জলের বুদ্‌বুদ্‌, কিবা অদ্ভুত, দুনিয়ার সব আজব খেলা।
আজি কেউ পাদ্‌সা হয়ে, দোস্ত লয়ে, রংমহলে করছে খেলা;
কাল আবার সব হারায়ে, ফকীর হয়ে, সার করেছে গাছের তলা।
আজি কেউ ধনগরিমায়, লোকের মাথায়, মারছে জুত এরিতলা;
কাল আবার কোপ্‌নী প'রে, টুক্‌নী ধরে, কাঁধে ঝোলে ভিক্ষার ঝোলা।
আজ রে যেখানে সহর, কত নহর, বসিয়াছে বাজার মেলা,
কাল আবার তথায় নদী, নিরবধি, করছে রে তরঙ্গ-খেলা।
কাঙ্গাল কয় পাদ্‌সা উজীর, কাঙ্গাল ফকীর, সকলি ভাই ভোজের খেলা;
মন তুমি যখন যা হও, ঠিক পথে রও, ধর্ম্মকে ক'র না হেলা।

৫

বচ্ছে ভবনদীর নিরবধি খরধার।
দেখ, ক্ষণকাল বিরাম নাই এই দরিয়ার॥
ডিঙ্গা ডেঙ্গি পিনাশ বজ্‌রা, মহাজনী নৌকায়,
পাপী তাপী সাধু ভক্ত, চড়নদার তার সমুদায়।
ভাসিছে দরিয়ার জলে, ইচ্ছামত নৌকা চলে,
হাল ধ'রে তার সুকৌশলে, বসে আছে কর্ণধার॥ মন সবার,
কর্ণধারের ইচ্ছামত, কেহ চলে উজায়ে,
মনের সুখে জ্ঞান মাস্তলে, ভক্তিপাল উড়ায়ে।
কেহ আবার মনের দোষে, ভেটেনেতে যাচ্ছে ভেসে
পাকে ফেলে অবশেষে, ডুবায় তরি কর্ণধার॥ মন সবার,
কেহ আবার ক্রমাগত বলে বলে ভাটিয়ে,
অপার সাগরে, পড়ে নদীর মুখ ছাড়িয়ে।

সাগরের তরঙ্গ ভারি, স্থির নাহি থাকে তরি ;
লোণা জলে জীর্ণ করি, ডুবায় তরি কর্ণধার ॥ মন সবার,
সাধু মহাজন যত, বাদাম তুলে দরিয়ায়,
সুবাতাসে চলে তারা, মুখে নামের সারি গায়।
ঠিক না থাকলে হালি, অমনি নৌকা করে গালি ;
গুপ্ত চড়ায় চোরা বালি, ডুবায় তরি কর্ণধার ॥ মন সবার,
কাঙ্গাল বলে কাঙ্গালের পুঁজি পাটা যা ছিল,
বারে বারে ডুবে ভবে, সকলি ত খোয়াল।
খাবি খেয়ে অনেক কাল, আবাব তুলে দিলাম পাল ;
সাবধানে ধর হাল, বিনয় করি কর্ণধার ॥ মন আমার,

৬

শূন্য ভরে একটি কমল আছে কি সুন্দর !
নাই তার জলে গোড়া, আকাশ-জোড়া, সমান ভাবে নিরন্তর ॥
কমলের সহস্রেক দল,
তাতে বিরাজ করে, সোনার মাণিক, কিবা সে উজ্জ্বল ,
তারে যে জেনেছে, যে পেয়েছে, সেই হয়েছে দিগম্বর ॥
কমলের ডাঁটাতে কাঁটা,
আবার ছয়টি সাপে, জড়িয়ে ধ'রে করেছে লেঠা ,
কেবল পায় রে দেখা, যারা বোকা, সাপের ফণা ভয়ঙ্কর ॥
ফিকিরচাঁদ ফকীরে বলে,
সেই সাপকে ধরে, বশ করেছে, যে জন কৌশলে ;
কেবল সে পেয়েছে, নিজের কাছে, সোনার মাণিক মনোহর ॥
(হায় রে পাগল)

শেষ জীবন

হরিনাথের শেষ জীবনের কথা আমরা তাঁহার প্রিয়শিষ্য অক্ষয়কুমারের ভাষায় বর্ণনা করিব। অক্ষয়কুমার লিখিয়াছেন :—

> হরিনাথ আবাল্য ধর্ম্মানুপ্রাণিত হৃদয়ে সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতেন। যৌবনে স্বদেশসেবায় নিযুক্ত থাকিবার সময় যে আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম একটি ক্ষুদ্র কবিতায় লিখিয়া গিয়াছেন,—
>
> পাপেতে পৃথিবী ভার
> ধর্ম্ম তথা নাই আর॥
> অনেকে "মিলের" ছাত্র।
> ধর্ম্ম কর্ম্ম কথা মাত্র॥
> কপটতা ধর্ম্ম সাজে
> পৃথিবী ঢাকিয়া আছে॥
> ধর্ম্ম যদি চাও ভাই।
> ধর্ম্মসাজে কাজ নাই॥
> কপটতা পরিহর।
> ভাল হও ভাল কর॥
>
> এই আদর্শ হইতে প্রাণে যে ধর্ম্মানুরাগ জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতেই শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। এক দিনের জন্যও তাঁহার লেখনী বিশ্রাম লাভ করে নাই। "ব্রহ্মাণ্ডবেদ" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ মাঝে মাঝে তাঁহার সাধনতত্ত্ব

প্রকাশ করিত, এবং ক্ষয়রোগে শয্যাশায়ী হইয়াও মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে “মাতৃমহিমা” নামে একখানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। ২২শে চৈত্র তাঁহার মৃত্যুদশা উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু সে যাত্রা রক্ষা পাইয়া যে শেষ উপদেশকবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই মুমূর্ষু সাহিত্যসেবকের প্রাণের নিবেদন প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে! সেই শেষ উপদেশ এখনও যেন কর্ণোপান্তে ধ্বনিত হইতেছে,—

আগেও উলঙ্গ দেখ, শেষেও উলঙ্গ।
মধ্যে দিন দুই কাল বস্ত্রের প্রসঙ্গ॥
মরণের দিন দেখ সব ফক্কিকার।
তবে কেন মূঢ় মন কর অহঙ্কার॥
আমি ধনী আমি জ্ঞানী মানী রাজ্যপতি।
শ্মশানে সকলের দেখ একরূপ গতি॥
কেবা রাজা, কেবা প্রজা, কে চিনিতে পারে।
তবে কেন মর জীব ধন-অহঙ্কারে॥
পুঁথি পড়, পাঁজি পড় কোরাণ পুরাণ।
ধর্ম্ম নাই এ জগতে সত্যের সমান॥
সত্য রাখি কর কর্ম্ম সংসার পালন।
পাপ নাহি হবে দেহে মৃত্যুর কারণ॥
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু সকলেই জানে।
লোভের ধাঁধায় প'ড়ে কেহ নাহি মানে॥
না মানে কুবুদ্ধি, লোক মনে ভরা মল।
আগুনে পুড়িয়া মরে পতঙ্গের দল॥

মায়ের সমান নাই শরীরপালিকা।
ভার্য্যার সমান নাই শরীরতোষিকা॥
আনন্দ কারণ দেখ বালক বালিকা।
সর্ব্বদুঃখহরা দুর্গা রাধিকা কালিকা॥

৫ই বৈশাখ ১৩০৩ (১৬ এপ্রিল ১৮৯৬) পুণ্য অক্ষয়-তৃতীয়ায় ৬৩ বৎসর বয়সে কাঙ্গাল হরিনাথ সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

সংশোধন ও সংযোজন

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১১ : তারাশঙ্কর তর্করত্ন

পৃ. ১৬—১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে তারাশঙ্করের মৃত্যু হয়। তাঁহার স্থলে ১৫ নবেম্বর ১৮৫৮ তারিখে শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় ১৫০৲ বেতনে নদীয়ার ডেপুটি ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এ-বিষয়ে Report on Public Instruction in Bengal, 1866-67, App. A, p. 7 দ্রষ্টব্য।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১২ : অক্ষয়কুমার দত্ত

পৃ. ৩৩—'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' ২য় ভাগের প্রকাশকাল—ইং ১৮৫৩, ভ্রমক্রমে ইং ১৮৫২ মুদ্রিত হইয়াছে।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—২৩ : মধুসূদন দত্ত

পৃ. ৯০—মধুসূদনের ঢাকা গমনের তারিখ "১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি (?)" বলা হইয়াছে। ইহা ঠিক নহে। মধুসূদন ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে—খুব সম্ভব সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় গিয়াছিলেন। ২২ সেপ্টেম্বর ১৮৭১ তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' ঢাকার 'হিন্দু হিতৈষিণী' হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল :—

"গত শনিবার ঢাকায় জ্ঞানকরী সভায় বহু-বিবাহ নিবারণ বিষয়ের আন্দোলন হয়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীনাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় মনুবচনে বহুবিবাহের ব্যবস্থার স্থূল উল্লেখ করিয়াছিলেন। তথায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত উপস্থিত ছিলেন। শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, দত্তজ মহাশয়

মন্বাদি শাস্ত্রের নিন্দা করিয়া তাহা বুড়ীগঙ্গায় নিক্ষেপ করিতে উপদে দিয়াছেন।"

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৩০ : মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ

পৃ. ৩০—**'আরবীয়োপাখ্যান'** পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ।

পঞ্চম খণ্ডের প্রকাশকাল—১৭৭৯ শক, পৃ. ৩৪০।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৩১ : যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

যোগেন্দ্রনাথের আরও তিনখানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি :—

১। **চৌকিদার-দর্পণ**। জ্যৈষ্ঠ ১৩০২। পৃ. ৭৯।

২। **বীরপূজা (১)**। ১০ মার্চ ১৯০০। পৃ. ১২।

রামতনু লাহিড়ী ও রাজনারায়ণ বসু।

৩। **বীরপূজা (২)**। ২২ মে ১৯০০। পৃ. ৪৬।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অঘোরনাথ গুপ্ত; প্যারীচরণ সরকার ও প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর; কেশবচন্দ্র সেন।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৩২ : ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইন্দ্রনাথের আর একখানি পুস্তকের উল্লেখ করিতে ভুল হইয়াছে, উহা বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ইন্দ্রনাথ-কৃত সরল ব্যাখ্যা ও টীকা সমেত—

খাজানার আইন অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশের প্রজাস্বত্ববিষয়ক ১৮৮৫ সালের ৮ আইন। পৌষ ১২৯২। পৃ. ১৭৬।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বাংলা-সাহিত্যের সকল স্মরণীয় সাধকের প্রামাণিক জীবনী ও কীর্ত্তিকথা প্রচারই এই চরিতমালার উদ্দেশ্য।

প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।৹ মাত্র, কেবল * চিহ্নিত পুস্তকগুলি ।৹

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ, ২। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, রামকমল ভট্টাচার্য্য, ৩। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ৪। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫। রামনারায়ণ তর্করত্ন, ৬। রামরাম বসু, ৭। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য, ৮। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, ৯। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী, ১০। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ১১। তারাশঙ্কর তর্করত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ১২। অক্ষয়কুমার দত্ত, ১৩। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ১৪। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, *১৬। রামমোহন রায়, ১৭। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, রাধামোহন সেন, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরত্ন হালদার, *১৮। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯। প্যারীচাঁদ মিত্র, ২১। দীনবন্ধু মিত্র, *২৩। মধুসূদন দত্ত, ২৪। হরিশ্চন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, ২৫। বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বলদেব পালিত, ২৬। শ্যামাচরণ শর্ম্ম সরকার, রামচন্দ্র মিত্র, ২৭। নীলমণি বসাক, হরচন্দ্র ঘোষ, ২৮। স্বর্ণকুমারী দেবী, ২৯। মীর মশার্‌রফ হোসেন। ৩০। রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, লালমোহন বিদ্যানিধি, ৩১। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, ৩২। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩৩। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৪। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩৫। হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ) ৩৬। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (যন্ত্রস্থ)।

শ্রীসজনীকান্ত দাস-লিখিত

১৫। উইলিয়ম কেরী।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল-লিখিত

২০। রাধাকান্ত দেব।

শ্রীসজনীকান্ত দাস ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত

*২২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।